

# ব্যাটিলে ফর পাণ্ডয়ার

তেলরাজনীতি ও পরাশক্তির উত্থান-পতন

সোহেল রানা



গাউয়ান

পা ব লি কেশ ন স

# সূচিপত্র

প্রথম অংশ	
মহাশক্তির মহাপতন	১৫
সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র	২২
তালেবান পুনরুত্থানের রহস্য	২৬
আফগানিস্তান সাম্রাজ্যবাদীদের গোরস্থান	৩২
হিটলার, হলোকাস্ট, জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদ	৩৭
বণিকের ছদ্মবেশে পারস্যে ইউরোপের গুপ্তচর	৩৯
ইরানের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেয়াল 'জাগ্রোস'	৪১
তৈমুরের দরবারে বুলবুল-ই সিরাজ	৪৪
গুপ্তচররা ধর্মযাজককে খুঁজে পেয়েছেন	৪৮
পারস্যে তেলখনি আবিষ্কার	৫১
মসলার যুদ্ধ	৫৩
পেট্রোলিয়ামের ভূ-রাজনীতি ও ব্রিটেন	৫৭
ব্রিটেনের অটোমানবিরোধী ষড়যন্ত্র	৬১
আরব-ইজরাইল দহরম-মহরম	৬৩
তেল বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে জার্মানির পতন	৬৫
মার্কিন তেল বাণিজ্যে রাশিয়ার হানা	৬৮
তেল বাণিজ্যে রথসচাইল্ড পরিবার	৬৯
সেভেন সিস্টার্স-এর হাতে বিশ্ব তেলের বাজার	৭১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি বদলে দেয় তেল	৭২
ব্রিটেনকে ডিঙিয়ে পরাশক্তি হওয়ার দৌড়ে আমেরিকা	৭৩
রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের কৌতুক	৭৬
চীনা সমাজতন্ত্র যেভাবে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল	৮০
বলশেভিক বিপ্লব	৮২
রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ	৮৫

চীন ও সাম্রাজ্যবাদ	৮৯
ভারতবর্ষে ইংরেজদের লুটপাটের ইতিহাস	৯০
আফিম নিয়ে যুদ্ধ	৯৩
চীন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মাও সে তুং	৯৬
গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড	১০১
সাদা-কালো ব্যাপার না, বিড়াল হাঁদুর ধরতে পারলেই হলো	১০৬
যেভাবে পরাশক্তি হলো চীন	১১০
ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে কে	১১৫
তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীদের নজর	১২০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানি ও তার ট্র্যাজেডি	১২৪
তেল ব্যবসায়ীদের গোপন সমঝোতা	১২৬
আমেরিকায় মহামন্দা	১২৭
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা ও ডলারের উত্থান	১৩০
তেল দখলে ইরানে ইংরেজ হানা	১৩২
ইরানের মোসাদ্দেককে সরানোর চক্রান্ত	১৩৬
সিআইএ-র ব্লু-প্রিন্টে ইরানে ক্ষমতার পালাবদল	১৩৮
ইতালীয় তেল ব্যবসায়ী এনরিকো মান্তেই-এর হত্যারহস্য	১৪৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুরবস্থা ও নিষ্পন্ন শক	১৪৮
তেল অবরোধ সামাল	১৫১
ডলার যেভাবে পেট্রোডলারে রূপ নিল	১৫৩
ইরানের ইসলামি বিপ্লব	১৫৬
ইসলামি বিপ্লবের নেপথ্যে যে বিদেশি গ্রাম	১৫৯
উপসাগরীয় যুদ্ধ : সাদ্দাম হোসেন ও তেল	১৬২
উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা	১৭১
কুর্দি সংকট	১৭৫
কুর্দি নেতা মুস্তফা বারজানিকে হত্যার চেষ্টা	১৮১
বাথ পার্টি ও সাদ্দামের উত্থান	১৮৪
গোড়াতেই নিষ্ঠুরতা	১৯১
সাদ্দামের গুম-খুনের শাসন	১৯৫

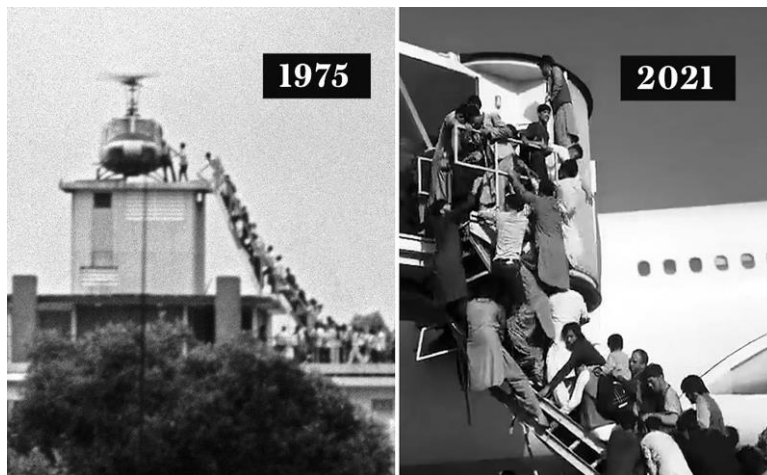
কুর্দি বিদ্রোহ ও হালাবজা ট্রাজেডি	১৯৯
ইরাকে আমেরিকার আত্মসন কি পূর্বপরিকল্পিত	২০৪
টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা	২০৭
আফগানিস্তানে আমেরিকার দীর্ঘ ২০ বছরের লড়াইয়ের সূচনা	২১০
তালেবানের জন্ম ও উত্থান	২১৭
তালেবান উত্থাত কি পূর্বপরিকল্পিত	২২১
খনিজ সম্পদের ভান্ডার আফগানিস্তান	২২৭
আফগানিস্তানে শেষ কমিউনিস্ট শাসকের পরিণতি	২৩১
<b>দ্বিতীয় অংশ</b>	
সৌদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	২৪৪
তেল যেভাবে সৌদি আরবের চেহারা পালটে দিলো	২৪৭
আরামকো	২৫২
আরামকো নিয়ে বিবাদ	২৫৬
মুখোমুখি বাদশাহ সউদ ও ভাই ফয়সাল	২৬১
কীভাবে এলো ওপেক	২৬৪
সউদকে ক্ষমতা থেকে সরানোর প্রস্তুতি	২৬৬
সৌদি আরবের নতুন বাদশাহ ফয়সাল	২৬৯
বাদশাহ ফয়সাল হত্যাকাণ্ড	২৭১
কেন খুন হলেন বাদশাহ ফয়সাল	২৭৩
পবিত্র কাবা অবরোধ	২৭৬
কাবার বিদ্রোহীদের পরিণতি	২৭৮
আরামকো সৌদির হলো	২৮২
ওসামা বিন লাদেন	২৮৩
উপসাগরীয় যুদ্ধ ও আরামকোর তেল ব্যবসা	২৮৫
ভূমধ্যসাগর ও তেল-গ্যাসের লড়াই	২৮৭
কী ছিল লুজান চুক্তিতে	২৯২
সাইপ্রাস নিয়ে দ্বন্দ্ব	২৯৪
ইস্তাম্বুল খাল	২৯৯
সহায়ক গ্রন্থসমূহ	৩০৩

## মহাশক্তির মহাপতন

১৬ই আগস্ট, ২০২১। পত্রিকার পাতায় লাল কালির ঢাউস শিরোনাম—‘তালেবানের হাতে কাবুলের পতন...’

কাবুলজুড়ে উড়ছে তালেবানের পতাকা। ২০ বছর ধরে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো সেই পুরোনো যোদ্ধারা এখন কাবুলের হর্তাকর্তা। মাঝখানে অসংখ্য মৃত্যু আর দুঃসহ স্মৃতির বোঝা। ২০০১ সালে আমেরিকার হাতে শুরু হওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের পথে প্রথম বহুজাতিক এনকাউন্টারের শিকার হয়েছিল যে দেশটি, তার নাম আফগানিস্তান—আড়াই লাখ বর্গমাইলের এক পার্বত্য ভূখণ্ড। আমেরিকা স্লোগান তুলেছিল—‘হয় তুমি আমার পক্ষে, নাহয় তুমি সন্ত্রাসবাদী।’ পরের ২০টা বছর আমেরিকা আর তার দোসররা ছুটেছে তথাকথিত ‘ইসলামি সন্ত্রাস’ নামের এক ছুঁচোর পেছনে। পশ্চিমা মিডিয়া এই ছোট্টাছুটিরই নাম দিয়েছে ‘ওয়ার অন টের’।

২০ বছরে আফগান রাজধানী কাবুলের চেহারাও পালটে গেছে অনেকখানি। পুরোনো নগরী গায়ে-গতরে ঝকঝকে তকতকে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পা চেটে উত্থান ঘটেছে নব্য ধনিক শ্রেণির। শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েছে। ৬ লাখ জনসংখ্যার পুরোনো কাবুলে এখন অর্ধকোটি মানুষের বসবাস। কাবুল যেমন পাশ্চাত্যের পরশে বদলে গেছে, তেমনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব হয়েছে সম্প্রতি ক্ষমতায় ফেরা তালেবান। নতুন তালেবানের সামনে অগ্নিপরীক্ষা—আফগানিস্তান কি শান্ত হবে? জনগণ কি যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে?



পাশাপাশি দুটো ছবি। প্রথমটি তোলা হয়েছে ১৯৭৫ সালে, সায়গনে। আর দ্বিতীয়টির পটভূমি ২০২১ সালের কাবুল। ভিন্ন দুই শহর, ভিন্ন সময়, ভিন্ন প্রেক্ষাপট, কিন্তু বিদায়ের ধরনে কত মিল!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যে কয়টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ছিল ভিয়েতনাম ও আফগান যুদ্ধ। তথাকথিত কমিউনিস্ট দুর্বৃত্তদের রুখতে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়ায় ১৯৬৫ সালে। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সেনাদের ভিয়েতনাম রণাঙ্গন ছাড়তে হয়েছিল একেবারে শূন্য হাতে। তার দুবছর বাদেই তখনকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনের পতন হয়। আমেরিকান সমর্থনপুষ্ট সরকারের লোকজন যে যার মতো পালিয়ে বাঁচে। সেই পতনের সাথে ২০২১ সালের কাবুল পতনের মিল দেখছেন অনেকেই। ব্যবধান অবশ্য বেশি নয়, মাত্র ৪৬ বছর!

দুই দশকের হুঁদুর-বিড়াল খেলা শেষে আফগানিস্তান থেকে তাঁর গোটাতে হয়েছে বিশ্ব পরাশক্তিকে। লজ্জাজনক এই বিদায়ের পর মার্কিন নেতৃত্ব বলছে— ভবিষ্যতে আর কোনো দেশ মেরামত করতে যুদ্ধে যাবে না আমেরিকা। জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন—

‘বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তনের এটাই সময়। এ সিদ্ধান্ত শুধু আফগানিস্তান নিয়েই নয়; অন্য যেকোনো দেশ পুনর্গঠনে বড়ো পরিসরে সামরিক অভিযান চালানোর এটাই পরিসমাপ্তি!’

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অর্ধশত বছর পরের তিক্ত এই অভিজ্ঞতায় মার্কিনদের তেল চিটচেটে ভাব দূর হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদীদের তাড়া খাওয়ার যে ইতিহাস, আমেরিকা তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অতীতের দুই পরাশক্তি—ব্রিটেন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের লজ্জাজনক পরিণতিই তারা বরণ করেছে। এখন আমেরিকার এ প্রস্থান গৌরবের, না অসম্মানের, নাকি কেবলই কৌশলগত পদক্ষেপ বা ভিন্ন কোনো ইতিহাসের সূচনা—সে আলোচনাকে অতটা গুরুত্ব না দিলেও চলে। কাবুল আমেরিকার দখলমুক্ত হয়েছে, আপাতত এটাই প্রশান্তি। তবে পশ্চিমের উদ্বিগ্ন চোখের দৃষ্টি এখনও কাবুলের দিকে—আবারও কি পুরোনো পথে হাঁটবে তালেবান?

## তৈমুরের দরবারে বুলবুল-ই সিরাজ

‘কালো তিল কপোলে সেই সুন্দরী,  
আপন হাতে ছুঁলে হৃদয় আমার,  
বোখারা তো কোন ছার, সমরখন্দও  
খুশি হয়ে তাকে দেবো উপহার।’

রক্ত ঝরানো যাদের নেশা, হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের নীতি। মঙ্গোলদের কথাই ধরা যাক; ভর দুপুরের তেতে ওঠা রোদ, দৈত্যের মতো ধেয়ে আসা বালুঝড় কিংবা হিমাচল থেকে উড়ে আসা হু হু হাওয়ার স্পর্শ মাড়িয়ে তারা ছুটে গেছে আফ্রিকা-ইউরোপের প্রান্তে। ১২৬০ সালে মিশরের মামলুকদের<sup>১</sup> হাতে মার খাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো শক্তি মঙ্গোলদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। বলতে পারেনি—‘আমরা তোদের রুখে দিলাম!’

বিশাল চারণভূমি ডিঙিয়ে ক্ষিপ্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে রুদ্ধশ্বাসে শত সহস্র কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া মঙ্গোলদের বলা যেতে পারে খুনে অভিযাত্রীর দল। শত্রুর রক্তের মধ্যেই এরা আজীবন খুঁজে গেছে নিজেদের টিকে থাকার শক্তি। কিন্তু রক্ত ঝরিয়ে ভূমির দখল নিলেই কী আর শাসক হওয়া যায়!

মঙ্গোলরা হায়েনার মতো ভিন্নজাতির লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দখল করেছে একের পর এক জনপদ, বিস্তীর্ণ চারণভূমি। কিন্তু বিশাল ভূখণ্ডের মালিকানা তো আর শাসক হওয়ার শর্ত নয়। মঙ্গোলরা তাই না হতে পেরেছে শাসক, না ঘটাতে পেরেছে কোনো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মুঘলরা। ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্যাভ্যাস আর লাইফস্টাইলই তারা বদলে দিয়েছে ৩০০ বছরের শাসনে।

মঙ্গোলদের সাথে মিল আছে মধ্য এশিয়ার ত্রাস তৈমুরের। বিদেশিদের কেউ তাকে বলে তাইমুর, কেউ-বা বলে তিমুরলেইন। মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিসের মতো তৈমুরেরও ছিল রক্ত আর সাম্রাজ্যের নেশা। তার অস্থির স্বভাব আর আগ্রাসী তলোয়ার কখনোই প্রতিবেশী শাসকদের থিতু হতে দেয়নি। এই যুদ্ধবাজ তৈমুরের রাজধানী ছিল সমরখন্দ। এটি বর্তমান উজবেকিস্তানের একটি শহর। মধ্য এশিয়া থেকে বের হয়ে আসা উন্মত্ত খুন তৈমুরের তলোয়ার রক্ত ঝরিয়েছে তুর্কমেন,

<sup>১</sup> মিশরের মামলুকরা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মামলুক শাসন কায়েম করেছিল। কিপচাক ও অন্যান্য অনেক তুর্কি জনগোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত দাস সৈনিকদের মাধ্যমে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মামলুকরা সরাসরি সুলতানের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিতেন। সুলতান তাদের জন্য নীলনদের রাওজা দ্বীপে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে দেন। এখানে মামলুকরা সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আদর্শিক দীক্ষাও গ্রহণ করত। সময়ের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে লেভান্ত, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাগিয়ে নেয় সুলতানের পদ। ১২৬০ সালে আইন জালুতের যুদ্ধে মামলুক সালতানাত মঙ্গোল বাহিনীকে পরাজিত করে।

আরব, পারস্যিান আর উসমানীয়দের। সেই তৈমুরের সাম্রাজ্যে বসেই প্রেয়সীর জন্য কবিতা লিখে ঝড় তুলে দিয়েছেন পারস্যের এক কবি—হাফিজ সিরাজি।

তঁার পুরো নাম খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিজ-ই-সিরাজি। পারস্যিানরা এই সুফি কবিকে আদর করে ডাকে ‘বুলবুল-ই-সিরাজ’। কবি সিরাজ মধ্য এশিয়ার ঐতিহাসিক নগরী বোখারাকে গণনাতেই রাখেননি। বোখারা তো বটেই, প্রিয়তমার গালের তিলের জন্য তিনি ছেড়ে দিতে চেয়েছেন তৈমুরের সমরখন্দকেও। হাফিজ তঁার প্রিয়তমাকে তৈমুর সাম্রাজ্যের রাজধানী দিয়ে দেবেন, সম্রাট তা মানবেন কেন? সুতরাং, কবিকে তলব করা হলো তৈমুরের দরবারে। রাজদরবারে কী জবাব দিয়েছিলেন বুলবুল-ই সিরাজ?

‘মহান সম্রাট! আসলে আপনি ভুল শুনেছেন। কবিতায় “সমরখন্দ ও বোখারা”র পরিবর্তে হবে “দো মণ কন্দ ও সি খোর্মারা”। আমি তো প্রিয়ার গালের তিলের বদলে দুই মণ চিনি আর তিন মণ খেজুর দিতে চেয়েছি মাত্র!’

হাফিজ কি আসলেই তৈমুরকে এমন উত্তর দিয়েছিলেন? কারও কারও মতে, হাফিজ এই কথা বলেননি, তৈমুরের সামনে এমন কথা বলার সাহস মূলত কেউ-ই রাখতেন না। রাজদরবারে ক্ষমা চেয়ে নেন হাফিজ। তৈমুর খুশি হয়ে মূল্যবান উপহার আর অর্থকড়ি দেন তাঁকে। পারস্যের আরেক কবি শেখ সাদিকে নিয়েও আছে এমন অনেক মুখরোচক গল্প। শেখ সাদি, উমর খৈয়াম আর ফেরদৌসীর মতো অনেক রত্নকে গর্ভে ধরেছে পারস্য। তার বুকে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে ইসফাহানের মতো নান্দনিক নগরী। ইসফাহান দেখলেই যেন পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য দেখা হয়ে যায়। আর সেজন্যই তো বলা হয়—‘শাহরে ইসফাহান, নেসফে জাহান।’

মুঘল সম্রাটদের মাতৃভূমি এই পারস্য। বাবর থেকে নাদির শাহ পর্যন্ত অনেক বিজেতা খাইবার পাস দিয়ে ভারতে এসে সাম্রাজ্য গড়েছেন। আবার কেউ কেউ এসে সম্পদ লুট করে ফিরে গেছেন নিজের দেশে। নাদির শাহ যাওয়ার সময় নিয়ে গেছেন ময়ূর সিংহাসন আর কোহিনুর হীরকখণ্ড। কিন্তু লুণ্ঠিত সম্পদ ভোগ করার ভাগ্য হয়নি তার। স্বদেশে ফেরার আগেই যাত্রাপথে খুন হয়েছেন আততায়ীর হাতে। সেই কোহিনুর এখন ব্রিটিশ রানির মাথায় শোভা পাচ্ছে। কিন্তু ময়ূর সিংহাসন কোথায়, সেই তথ্য আজও অজানা।

মুঘল সম্রাট আকবর তঁার জিন্দেগির বড়ো একটা অংশ বিয়ে-শাদি করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। হয়তো এটাই ছিল তার কাছে এক অ্যাডভেঞ্চার। এত বেশি পত্নী-উপপত্নীর বহর খোদ সম্রাটকেই বিভ্রাটে ফেলে দিত মাঝে মাঝে। সকালে ঘুম ভেঙে যে নারীকেই সামনে পেতেন, ভাবতেন—‘আরে! এ তো আমারই স্ত্রী।’ গিন্নির অভাব নেই আরবদেরও। প্রতিবেশী ইরানিদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটা থাকবে না, তা কী করে হয়? পাহলভি পরিবারের আগে কাজার রাজবংশ ১৫০ বছর ধরে পারস্য শাসন করেছে। তাদের কাছেও বিয়ে-শাদি ছিল ডাল-ভাত। কাজাররা কেন এত বিয়ে করতেন? বই-পত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই। কী সেই প্রয়োজনীয়তা?



## ভারতবর্ষে ইংরেজদের লুটপাটের ইতিহাস

ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে প্রায় ২০০ বছর। এই সময়ে তারা ভারতবর্ষ থেকে লুট করেছে প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার সমমূল্যের সম্পদ। মাত্র কয়েক বছর আগের এক গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য। একবার ভাবুন তো, এই অঙ্কটা ঠিক কত বড়ো! এই লুট করা ডলারের অঙ্ক ব্রিটেনের এখনকার জিডিপি থেকে ১৫/১৬ গুণ বেশি!

ইংরেজরা নিজেদের ভারতবর্ষ উন্নয়নের রূপকার ভাবতে পছন্দ করে। তারা নাকি সাম্রাজ্য গড়ে বরং ভারতের উপকারই করেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে রেল চালু করেছে, বড়ো বড়ো ব্রিজ গড়েছে, স্থাপনা তৈরি করেছে, প্রণয়ন করেছে নানাবিধ আইনকানুন। তাদের এই উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে আমরা অনেকে আবার হাততালিও দিই। ভারতবর্ষকে দেওয়া ছাড়া তাদের নাকি অর্থনৈতিক কোনো অর্জন নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি ইংরেজরা ভারতে এসেছিল নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দিতে? টানা ২০০ বছর ধরে এই মহান কাজটি করে গেল তারা?

কিন্তু এই ইংরেজ বদান্যতার গল্প যারা দিয়ে থাকেন, তাদের নাকেমুখে জল ঢেলে দিয়েছে একটি গবেষণা। এই গবেষণাপত্র বেরিয়েছে খোদ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে—যেখানে দেখানো হয়েছে প্রায় ২০০ বছরের ভারতবর্ষ শাসনে ইংরেজ তথা ব্রিটিশরা এই অঞ্চল থেকে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যমানের সম্পদ নিয়ে গেছে। এটাকে বড়ো চুরিও বলতে পারেন, আবার লুটপাটও বলতে পারেন। গবেষক উৎস পাটনায়েক ১৭৬৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ট্যাক্স আর বাণিজ্য ডাটা থেকে বিশাল লুটপাটের এই অঙ্ক বের করেছেন। ইংরেজরা এই অর্থ-সম্পদ লুট করেছে অদ্ভুত এক ট্রেড পলিসি ব্যবহার করে। পূর্ণ কলোনি গড়ার আগে তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে চাল আর টেক্সটাইলসসামগ্রী কিনত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে। সে সময় সব দেশের সাথে রূপার মাধ্যমেই বাণিজ্য করত তারা। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ চলে যায় ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। বক্সারের যুদ্ধে মির কাসিমের পরাজয়ের পর আরও পোক্ত হয় ব্রিটিশ আধিপত্য। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ বাণিজ্য তখন তাদের করতলে। সরাসরি রাজস্ব আদায় শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আদায় করা অর্থের এক-তৃতীয়াংশ তারা ব্যয় করে নিজেদের ব্যবহার্য ভারতীয় পণ্য কেনার কাজে। এর অর্থ হলো—ভারতীয় পণ্য কিনতে নিজের পকেট থেকে টাকা দেওয়া লাগছে না। মানে ব্রিটিশরা ভারতীয় পণ্য পেত কোনো রকম মূল্য না চুকিয়েই। আর এই টাকাটা মূলত যেত ভারতের কৃষক আর তাঁতিদের পকেট থেকে। কিন্তু অসচেতন ভারতীয়রা এই চুরি ধরতেই পারেনি। ধরবেই-বা কী করে; ইংরেজরা ট্যাক্স আদায় করতে যাদের পাঠাত, তাদের আবার ভারতীয় পণ্য কেনায় পাঠাত না। দুটি দল একই হলে হয়তো কিছুটা আঁচ পাওয়া যেত। কিন্তু ধুরন্ধর ইংরেজরা ছিল খুব সতর্ক।

## চীন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মাও সে তুং

গত শতকের মধ্যভাগে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল চীন। রুশদের আদলে দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। রাশিয়ায় শ্রমিকরা বিপ্লবের মূল জোগানদার হলেও চীনে এই বিপ্লবের পেছনে ছিল কৃষকরা। মাও সে তুং-এর হাত ধরেই চীন প্রবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ধারায়। চীনা কমিউনিজমের আধ্যাত্মিক গুরু মাও-কে অনেকেই আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা ভাবে পছন্দ করেন। ভুলটা এখানেই। আজকের যে শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক চীন, তার কৃতিত্ব মাও-কে দেওয়া অন্যায় হবে; বরং এর কৃতিত্বের প্রকৃত হকদার মাওয়ের উত্তরসূরি সংস্কারপন্থি কমিউনিস্ট নেতা দেং জিয়াও পিং।

মাও-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্য কেউ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হতে পারেননি। তার দর্শন ‘মাওবাদ’ রক্তাক্ত করেছে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, নেপাল এমনকি শ্রীলংকার মতো দেশকেও। ১৯৪৯ সালে কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন মাও?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩৭ বছর আগে আরও একটি বিপ্লব দেখেছিল চীন। সেই বিপ্লবকে বলা হয় ঝিনহাই বিপ্লব বা চীন বিপ্লব; যার মধ্য দিয়ে উৎখাত হয়েছিল মাঞ্চু সাম্রাজ্য। গণবিপ্লবের মুখে চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। আড়াই শতকেরও বেশি সময় পর চীনে ক্ষমতা ফিরে পায় হান জাতির<sup>২</sup> লোকরা। ঝিনহাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। আর তার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট করা হয় ডাক্তার সান ইয়াং সেনকে। রাজতন্ত্র উৎখাত করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর তিনিই।

কিন্তু সান ইয়াং এই পদে বেশিদিন থাকতে পারেননি। যার সাথে সমঝোতা করে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সেই ক্ষমতালিপ্সু কমান্ডার ইউয়ান সিকাই-এর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। কমান্ডার সিকাই চীনকে আবারও রাজতন্ত্রে ফেরাতে চাইলেন, সম্রাট ঘোষণা করলেন নিজেই। সম্রাট ঘোষণার বছরখানেক বাদেই মারা যান সিকাই। এদিকে, সান ইয়াং সেন সমর্থিত গ্রুপটি বেরিয়ে এসে অন্যান্য ছোটো দলগুলোকে সাথে নিয়ে গঠন করে নতুন জাতীয়তাবাদী দল ‘কুওমিনটাঙ’। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দলটির নেতৃত্ব দেন সান ইয়াং। তারপর তার উত্তরসূরি করা হয় চিয়াং কাইশেককে। দলীয় প্রধানের পাশাপাশি কাইশেক একসময় গণতান্ত্রিক চীনের প্রেসিডেন্টও বনে যান।

<sup>২</sup> চীনে ৫৬টি জাতির মধ্যে হান জাতির লোকসংখ্যা সবচাইতে বেশি। পৃথিবীতে হান জাতিই সর্বাধিক লোকসংখ্যার জাতি। মূল চীনের শতকরা ৯২ ভাগ মানুষ নৃতাত্ত্বিক হান জাতিভুক্ত। সংখ্যায় এরা ১২০ কোটি। বেশিরভাগ মানুষ এই হানদেরই চৈনিক বলে উল্লেখ করে থাকে। হান জাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। চীনের শ্রমবাজার বলতে গেলে পুরোটাই হান জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। বলা যেতে পারে, দেশটির অর্থনীতি ও উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ধারিত হয়েছে এই জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে।

## যেভাবে পরাশক্তি হলো চীন

চীন এখন ‘পঞ্চম ড্রাগন’। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই স্বস্তির যাত্রা শুরু করেছে দেশটি। এর মধ্যে তার নীতিতে, বিধিতে আর আচরণে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এক সন্তান, দুই সন্তান নীতি থেকে বেরিয়ে সবশেষে গ্রহণ করেছে তিন সন্তান নীতি। সংস্কারের ডানায় ভার তুলে দিয়ে চীন আপাতত সফল। কিন্তু গত কয়েক দশকের এই সংস্কারের ধারা কতটা সমাজতান্ত্রিক ছিল, সে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই, সেখানে সংস্কার যতটা ভারী হচ্ছে, ততটাই হালকা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তবে সমাজতন্ত্রের মুখোশ টিকে থাকায় স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে সহজে।

সমাজতন্ত্রের চিরাচরিত ফর্মুলা ডিঙিয়ে চীন কেন অর্থনৈতিক সংস্কারে মন দিয়েছিল তার একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমত, দেশটির অর্থনীতিতে যে স্থবিরতা এসেছিল, তা কাটিয়ে ওঠা জরুরি ছিল। সেইসাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে দাদাগিরি ফলানোর জন্য যে প্রক্সি লড়াই চলছিল, সেখানে অংশগ্রহণ করাকে অনিবার্য মনে করেছিল চীন। সমাজতান্ত্রিক নীতি-কাঠামো ঠিক রেখে এই লড়াইয়ে সুফল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না প্রায়। ফলে নীতির প্রশ্নে আপস করতে হয়েছে তাকে। তবে সরকার টিকে থাকার প্রধান ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে জনগণের খুশি-অখুশিতে। তাই চীনা জনগণের জীবনমান উন্নয়নেও সরকারের লক্ষ্য ছিল স্থির।

সংস্কার করতে গিয়ে অর্থনীতির ওপর কমিউনিস্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমাতে হয়েছিল, সৃষ্টি করতে হয়েছিল ব্যক্তিগত খাত। এমনকি দূর করতে হয়েছিল বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সকল প্রকার বাধা। প্রথম কোনো চীনা শীর্ষ কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন দেং জিয়াও। এরপরই চীনে বিনিয়োগ শুরু করে আমেরিকা। সমাজতান্ত্রিক চেতনা এখানেই মার খেয়ে যায়। আর কাগজে-কলমে সমাজতান্ত্রিক হলেও পুঁজিবাদের ব্যামোতে ধীরে ধীরে আক্রান্ত হতে থাকে চীন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী দুই দশক চীনের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা মোটেও আশানুরূপ ছিল না। মাও-এর ‘গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড’ চীনের গ্রামাঞ্চলে গরিবের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য থেকে কোনো কিছু সঞ্চয় করতে পারছিল না। ছিল না বিদেশি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা। অবকাঠামোগত উন্নয়নেও নজর ছিল না কারও। সমাজতন্ত্রের নামে এই বাড়ন্ত দারিদ্র্যকে তাই সংস্কারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

## প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানি ও তার ট্র্যাজেডি

জার্মানির অদম্য যাত্রা মলিন করে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রু রাডের দীর্ঘ রাজতন্ত্রের সিলসিলা শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায়নি। জার্মান মিত্র উসমানীয়দের ভাগ্যেও জুটেছিল একই পরিণতি। যুদ্ধের পর সালতানাত ভেঙে গিয়ে কেবল আনাতোলিয়াকে ঘিরে জন্ম নেয় তুর্কি রাষ্ট্র। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর বিজয়ীদের চাপে জার্মান অর্থনীতি একরকম ধসে যায়, বেড়ে যায় রাষ্ট্রীয় ঋণ। রিকস ব্যাংক নোট ছাপিয়ে রাষ্ট্রের অর্থের ঘাটতি কমানোর উদ্যোগ নেয়। ফলে ১৯২০-এর দশকে উৎপাদনের তুলনায় জার্মানিতে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়। পরিণতি যা হওয়ার কথা তা-ই হয়, সমগ্র জার্মানিতে দেখা দেয় ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এটাকে বলা যেতে পারে ছোটোখাটো একটা ‘ইকোনমিক সুইসাইড’। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই মুদ্রাস্ফীতি টেনে নিয়ে গেল ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত। নিউইয়র্কের জেপি মরগ্যান অ্যান্ড কোম্পানি মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধব্যয়ের একটা অংশ বহন করেছিল, কিন্তু জার্মানির বেলায় কেউ এগিয়ে আসেনি। তার ওপর জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলো হাতিয়ে নিয়েছিল বিজয়ী দেশগুলো। বিশেষ করে টাঙ্গানিকা আর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা কুক্ষিগত করে ব্রিটেন। বাগদাদ রেলপ্রজেক্টের মাধ্যমে যে মার্কেট শুরু হয়েছিল, হাতছাড়া হয় সেটাও। ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মানির লৌহ আকরিকের ৭৫ শতাংশ খোয়া যায়। একইভাবে জিংক আকরিকের ৬৮ শতাংশ আর কয়লার ২৬ শতাংশ দখল হারায় পরাজিত জার্মানি। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এক-পঞ্চমাংশ ট্রান্সপোর্ট ফ্লিট, এক-চতুর্থাংশ ফিশিং ফ্লিট, দেড় লাখ রেলরোড কার, পাঁচ হাজার মোটর ট্রাক বাগিয়ে নেওয়া হয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এতেই শেষ নয়, সর্বমোট ১৩২ বিলিয়ন গোল্ডমার্ক (৬৬০ কোটি পাউন্ড) ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়—যা ছিল তৎকালীন জার্মানির সামর্থ্যের তিনগুণ বেশি।

৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর বিজয়ী মিত্রশক্তি এবং জার্মানির মধ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরের বছর ১০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয় সেটি। ফ্রান্সের ভার্সাই রাজপ্রাসাদে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির খসড়া হয়েছিল ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে। খসড়ার মূল নকশা করেন ব্রিটেনের ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জেস ক্ল্যামেনশো, যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন এবং ইতালির ভিটোরিও অরল্যান্ডো। এ চুক্তির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আফ্রিকার সবগুলো জার্মান কলোনি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য মিত্রশক্তির কুক্ষিগত হয়। শতকরা দশভাগ কমিয়ে আনা হয় জার্মানির রাষ্ট্রসীমা এবং জনসংখ্যা। জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে সংঘটিত সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য এককভাবে দায়ী করা হয় জার্মানদের।

## ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা ও ডলারের উত্থান

ভার্সাই সম্মেলনের পর দেখা গেল, বিশ্বের এক চতুর্থাংশ এলাকাই ব্রিটিশদের কবজায়। এজন্যই একসময় বলা হতো—ব্রিটিশদের সূর্য কখনো অস্ত যায় না। তার এক কলোনিতে যখন সূর্য ডুবছে, আরেক কলোনিতে হয়তো প্রভাতের অরুণ আলো। কারণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই তখন ব্রিটিশ উপনিবেশের একচ্ছত্র আধিপত্য। অবশ্য এর ৩০ বছরের মাথায় ইংরেজ সাম্রাজ্য মচকাতে শুরু করল, তাসের ঘরের মতো একে একে ভেঙে পড়ল সবগুলো কলোনি। ভারতবর্ষ ছাড়তে হলো, হাতছাড়া হয়ে গেল প্যালেস্টাইন।

অনেকেই মনে করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখনই হয়েছে বিদ্রোহ কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট তারা সামলে উঠতে পারছিল না। এ অবস্থায় কলোনি ছেড়ে আসাই ছিল এক ও অবিকল্প পথ। কারণ, যা লুটে নেওয়ার, আগেই তা নেওয়া হয়েছে। এরপর ভারতে থাকা মানে কেবলই খরচার খাতা দীর্ঘ করা। ফলে অল্প কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজদের পৃথিবী ছোটো হয়ে এলো। কলোনি গুটিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে সম্মান ও সুবিধাজনক উপায় খুঁজতে ভারতবর্ষে এলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তার আগমনের পাঁচ মাসের মাথায় গোটা ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত—দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগর, আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর এলাকা থেকেও কলোনি উঠিয়ে নেয় ইংরেজরা। এর পেছনে রাজনৈতিক সমীকরণ থাকলেও মূল কারণটা ছিল অর্থনৈতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ঋণ চূড়ায় পৌঁছায়। রপ্তানি নেমে আসে ৩১ শতাংশে। কাজেই টিকে থাকার জন্য মার্কিন নির্ভরতা ছিল অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য আমেরিকাও বিনা প্রতিদানে ব্রিটিশদের উপকার করতে এগিয়ে আসেনি। পারস্পরিক স্বার্থেই সহযোগিতার সম্পর্কে একজোট হয়েছিল তারা। এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপ-আমেরিকায় চালু হলো গোল্ড এক্সচেঞ্জ সিস্টেম। বলা হলো—‘ব্রিটন উডস সিস্টেম’-এর সাথে একমত প্রতিটি দেশ ডলার রেইটে সোনা জমা রাখবেন (১ আউন্স= ৩৫ ডলার করে) মার্কিন ব্যাংকে। কথামতো বিপুল পরিমাণ সোনা জমতে থাকল নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভে, সেইসঙ্গে ছাপানো হলো সমপরিমাণ মূল্যের কাগজে মুদ্রা। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাউন্ডকে ছাড়িয়ে ডলার হয়ে উঠল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা।

## তেল দখলে ইরানে ইংরেজ হানা

যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন যখন তার সাম্রাজ্য হারাতে চলেছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে হারানো এলাকাগুলোর তেল নিয়ন্ত্রণের কম চেষ্টা করেনি তারা। কিন্তু বিপত্তি শুরু হলো ইরানকে নিয়ে। ইরান শিয়াপ্রধান রাষ্ট্র। বিশ্বের সুন্নি রাষ্ট্রগুলোতে শিয়া মতবাদ রপ্তানি করার একধরনের মিশন আছে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবপরবর্তী সরকারের মধ্যে। তারও আগে থেকে ব্রিটিশদের সাথে দীর্ঘ সখ্যতার ইতিহাস আছে ইরানের। তেলের ব্যবসা হাতে রাখতে একসময় ইরানে ক্ষমতায় আনা হয়েছিল পাহলভি পরিবারকে। রেজা শাহ এবং মুহাম্মাদ রেজা শাহ—এই দুই পিতা-পুত্রের মধ্যেই সীমিত ছিল পাহলভিদের শাসনকাল। প্রথমে বাবাকে ক্ষমতায় বসানো হয়, পরে বাড়তি সুবিধার আশায় সাম্রাজ্যবাদীরা বাবাকে সরিয়ে বসায় ছেলেকে।

পাহলভিদের আগে ইরান শাসন করেছে কাজার রাজবংশ, তারও আগে সাফাভিদরা। সাফাভিদ বংশের প্রথম শাহ প্রথম ইসমাইল শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কাজাররা এসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয় ওলামাদের। কাজার রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল ধারাবাহিক বিক্ষোভ আর সশস্ত্র বিপ্লবের কারণে। ১৯০৬ সালে কাজারদের বিরুদ্ধে জনতার সশস্ত্র বিপ্লব রাষ্ট্রকে গণমুখী হতে বাধ্য করে। সর্বসাধারণের দাবি মেনে নিয়ে প্রণীত হয় সংবিধান, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ বিধান যুক্ত হয় তাতে। প্রতিষ্ঠিত হয় আইনসভা। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামই বহাল থাকে। কিন্তু বিপ্লবের যে মূল লক্ষ্য, সেই রাজতন্ত্রে উৎখাত সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশরাই সেটা হতে দেয়নি তখন। ইরানের এলিট গোষ্ঠী আর ওলামা সমাজকে কৌশলে বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল তারা, কিন্তু কেন?

কারণ, জনগণের হাতে ক্ষমতা গেলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য হারাত ব্রিটেন। অবশ্য কাজারদের দিয়েও যখন সম্পূর্ণ স্বার্থ হাসিল হচ্ছিল না, রেজা খানকে সামনে এনে কাজার রাজতন্ত্র উৎখাত করে ফেলাই ছিল ইংরেজদের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক কৌশল। ফলে পারস্যের খনিগুলো থেকে অবাধে তেল উত্তোলনের শর্তে রেজা খানকে ক্ষমতায় বসায় তারা।

নতুন শাহ রেজা খান মসনদে বসেই পারস্যকে বদলাতে শুরু করলেন। ইসলামি রাষ্ট্র থেকে সরে গেল দেশটি। পশ্চিমাদের অনুকরণে ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে মনোযোগ দিলেন রেজা খান। হয়তো এ কারণেই রেজা খানকে অনেকে দেখেন ইরানের আতাতুর্ক হিসেবে।

## ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন কি পূর্বপরিকল্পিত

উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে বিশ্ব তেল বাণিজ্য থেকে ছিটকে পড়ে ইরাক। পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশ ইরাকের তেলের ওপর নির্ভর করত, তারাও তেল আমদানির সুযোগ হারায়। তেলসমৃদ্ধ একটি দেশের তেল বিশ্ববাজারে অবাধে প্রবেশ করতে না পারায় জ্বালানি তেলের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই ইরাকের এই দুর্ব্যোমে পূর্ব ইউরোপকে অত্যন্ত বাজে পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিনিময়ে রাশিয়া থেকে তেল নিত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো; কিন্তু '৯১-এর যুদ্ধে সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রুশ তেল কিনতে প্রয়োজন পড়ে পশ্চিমা ডলার। কমপক্ষে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের তেল দেওয়ার কথা ছিল বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে—উপসাগরীয় যুদ্ধে সেই সাপ্লাই চেইন ধ্বংস হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে অনেকেই ভেবেছিলেন পৃথিবীতে শান্তি ফিরবে। তা আর ফিরল কই! আমেরিকা আরও আগ্রাসী হলো। রাশিয়া ও চীনের আগ্রাসন বন্ধের পর আমেরিকার ফোকাস ছিল অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করা। ৯১-পরবর্তী সময়ে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তখন জাপান, পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ধীরে ধীরে গ্লোবালিজেশনের ধারণা এলো। সম্ভাবনাময় শত্রুদের কৌশলে নিরস্ত্র করে শক্তিশালী হলো আমেরিকা। স্নায়ুযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছিল—কমিউনিস্ট আগ্রাসন ঠেকাতে তার বাহিনী প্রস্তুত। যদি কোনো দেশ সাহায্য চায়, সাহায্য করা হবে। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকার ক্ষমতায় আসেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হন ডিকচেনি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডনাল্ড রামসফেল্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদে বসানো হয় কন্ডোলিসা রাইসকে। এদের বেশিরভাগই ছিলেন তেল বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কেউ তেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, আবার কেউ ছিলেন কোম্পানির মালিক কিংবা উপদেষ্টা। চেনি একসময় হ্যালিবার্টন ইনকর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী ছিলেন। কন্ডোলিসা রাইস ছিলেন শেভরনের বোর্ড সদস্য। বাণিজ্যমন্ত্রী ডন ইভান্সও ছিলেন একজন বিখ্যাত অয়েলম্যান। বুশের নিজেরও তেল বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ছিল। বুশ যেভাবে পেট্রোলিয়ামকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এর আগে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ততটা করেনি। তেল আর জিওপলিটিক্স ছিল ওয়াশিংটনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চেনির কাজ ছিল এনার্জি পলিসি রিভিউ করা। অন্য ভাইস প্রেসিডেন্টের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ক্ষমতাবান ছিলেন তিনি। ২০০১ সালের এপ্রিলে চেনি ও জেমস বেকার এক প্রতিবেদনে জানান, আগামী দুই দশক যুক্তরাষ্ট্রের তেলনির্ভরতা বাড়বে। এতে আরও বলা হয়—বিশ্বে তেলের মজুত কমছে। সুতরাং নজর ফেরাতে হবে ইরাকের দিকে। এই প্রতিবেদনে তেলের ওপর মার্কিন নির্ভরতা স্পষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে বিদেশের মাটিতে থাকা তেল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবে—হঠাৎ-ই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই আলোচনা। বেশিরভাগ তেলই তখন জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর হাতে। আর স্বভাবতই মার্কিন স্বার্থ পূরণ করবে না তারা। চেনিরা টেনশনে পড় গেল। কীভাবে বাইরের তেল নিজেদের ঘরে আনা যায়।

## আফগানিস্তানে আমেরিকার দীর্ঘ ২০ বছরের লড়াইয়ের সূচনা

৭ অক্টোবর, ২০০১

টুইন টাওয়ারে হামলার ২৬ দিন পর শুরু হলো ‘অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম’। আরব সাগরে অবস্থান নেওয়া মার্কিন রণতরিগুলো গর্জে উঠল। ঝাঁকে ঝাঁকে টমাহক মিসাইল ছুটে গেল জালাল উদ্দিন রুমির জন্মভূমি আফগানিস্তানের দিকে। রাতের নিস্তর্রতা ভেঙে রাজধানী কাবুল, তালেবানের শক্তিশালী ঘাঁটি কান্দাহার আর ঐতিহাসিক শহর জালালাবাদ কেঁপে উঠল। যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সেদিন বুঝতে পারেনি—যে যুদ্ধের সূচনা তারা করেছে, দুই দশকেও সেখান থেকে বের হতে পারবে না তারা। ঘৃণাক্ষরেও ভাবেনি, দুই দশকের ব্যবধানে তালেবানের সাথে সন্ধি করে একেবারে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে নিজের দেশে।

১৯৯৬ সালের শেষ দিকে বা ৯৭-এর শুরুতে কাবুলের ক্ষমতায় আসে তালেবান। তাদের উত্থান নিয়ে কয়েক ধরনের বক্তব্য থাকলেও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হলো—তালেবানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হাত ধরে; প্রধানত কান্দাহার থেকে। আর সুযোগটা করে দিয়েছিল আফগান গৃহযুদ্ধ। তালেবান সৃষ্টির সূচনায় পাকিস্তান বা আইএসআই-এর কোনো ভূমিকা না থাকলেও তাদের উত্থান কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই আইএসআই-এর অবদান ছিল অসামান্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বসিয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট শাসক নজিবুল্লাহর প্রতিরক্ষামন্ত্রী উজবেক যুদ্ধবাজ নেতা আবদুল রশিদ দোস্তাম, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন রাব্বানির সমরনায়ক তাজিক নেতা আহমেদ শাহ মাসুদ এবং পশতুন নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়াররা একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে পুরো আফগানিস্তানকে ঠেলে দিয়েছিলেন ভয়ংকর এক গৃহযুদ্ধের দিকে। এই গৃহযুদ্ধ আফগানিস্তানকে গোরস্থান বানিয়ে দিয়েছিল। অথচ কয়েক বছর আগে এই মুজাহিদরাই একজোট হয়ে নিজেদের জমিনকে স্বাধীন করেছিলেন রুশদের কবল হতে।





সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছে আফগান মুজাহিদরা ।

রাশিয়ার শেষ সৈন্যটি আফগানিস্তান ছেড়ে যায় ১৯৮৯ সালে। দুই বছরের মাথায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গঠিত হয় ১৫টি নতুন রাষ্ট্র। রুশরা চলে যায় বটে, কিন্তু মস্কোপস্থি সরকারের কাছে রেখে যায় অগণিত স্কাড মিসাইল, যুদ্ধবিমান, হাজার হাজার টন গোলাবারুদ আর স্থলমাইন। কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষ আমেরিকাই-বা বাদ থাকবে কেন? তারাও মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয় তখনকার আলোচিত স্টিংগার মিসাইল আর গোলাবারুদের বিশাল ভান্ডার। বেশিরভাগ স্টিংগার মিসাইল ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও ৬০০-এর মতো মিসাইলের কোনো হদিস মেলেনি। পরে ইরান, ক্রোয়েশিয়া, কাতার আর উত্তর কোরিয়াতে চুরি হওয়া এই সব মিসাইলের খোঁজ পাওয়া যায়।

## কাবার বিদ্রোহীদের পরিণতি

সৌদিতে যে বছর কাবা অবরোধের ঘটনা ঘটে, সে বছরই ইরানে সংঘটিত হয় ইসলামি বিপ্লব। তেলের অর্থে তখন সৌদি আরবের সমাজ হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড ভোগবাদী। দেশটিতে ক্রমশ নগরায়ণ হচ্ছিল। নারী ও পুরুষরা প্রকাশ্যে একসাথে কাজ করত কিছু কিছু অঞ্চলে। এসব মানতে পারেনি সালাফিদের মধ্যে উগ্রবাদী এই গোষ্ঠী। জুহাইমান ছিল এই দলের নেতা। তাদের দৃষ্টিতে সৌদি শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং পাশ্চাত্য দ্বারা কলুষিত। কাজেই যেসব উৎসুক সৌদি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, তাদের দেখামাত্র গুলি করেছিল সশস্ত্র বিদ্রোহীরা। অনেকেই নিহত হয়েছিল সেদিন।

মাহদি হিসেবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল কাহতানি নামের যে ব্যক্তিকে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন তরুণ ধর্মপ্রচারক। ভালো ব্যবহার ও আচরণের জন্য তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। হাদিসের ভাষ্যমতে—মাহদির প্রকৃত নামের শুরুতে থাকবে ‘মুহাম্মাদ’। আর তাঁর বাবার নাম হবে আবদুল্লাহ। অর্থাৎ বিশ্বনবি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিল থাকবে তাঁর। কাহতানির নামের শুরুতে মুহাম্মাদ আছে, এমনকি তার বাবার নামও আবদুল্লাহ। আর সেজন্য কাহতানিকেই ইমাম মাহদি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন জুহাইমান।

কাহতানি অবশ্য ‘ইমাম মাহদি’ হতে চাননি শুরুতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাহদির ভূমিকায় রাজি করাতে সক্ষম হয় জুহাইমান। মসজিদ দখলের কয়েক মাস আগেই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়—মক্কার শত শত মানুষ ও হাজিরা স্বপ্নে দেখেছেন, গ্র্যান্ড মসজিদে ইসলামের ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন কাহতানি। জুহাইমানের অনুসারীরা তো বটেই, বাইরের কিছু লোকও বিশ্বাস করল এসব।

সৌদি আরবের বাদশাহ খালিদ তখন অসুস্থ। ক্রাউন প্রিন্স ফাহাদ বিন আবদুল আজিজই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখভাল করতেন। অসুস্থ খালিদের কাজ ছিল ফাহাদের নির্বাহী আদেশগুলোর অনুমোদন দেওয়া। কিন্তু কাবা অবরোধের ঘটনা যখন ঘটে, তখন আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিউনিসিয়ায় অবস্থান করছিলেন ফাহাদ। গোয়েন্দা পরিচালক তুর্কি আল ফয়সাল ছিলেন তার সফরসঙ্গী। ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান প্রিন্স আবদুল্লাহও দেশে ছিলেন না সে সময়। ফলে যা করার অসুস্থ রাজা খালিদ আর প্রিন্স সুলতানকেই করতে হতো। এর মধ্যেই অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত তিউনিসিয়া থেকে ফিরে কাবা উদ্ধারের ছক আঁকেন তুর্কি।

## ভূমধ্যসাগর ও তেল-গ্যাসের লড়াই

ভূমধ্যসাগরের চারপাশে তিন মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকা। অন্তত ১৭টি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে এই সাগরের তীরে। এই অঞ্চল ঘিরেই অতীতে উত্থান ঘটেছে রোমান, বাইজেন্টাইন, অটোমান, ফাতেমি এবং দামেশক থেকে নির্বাসিত হয় উমাইয়া সাম্রাজ্য। ভূমধ্যসাগর ভৌগোলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক—তিন দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এই সাগরের পূর্ব অংশে বিশাল গ্যাসের মজুত পাওয়া গেছে। আর তাতেই সামনে চলে এসেছে গ্রিস আর তুরস্কের পুরোনো বিরোধ। অবশ্য দুই দেশের মধ্যকার এ বিরোধ যতটা না অর্থনৈতিক, তার চাইতে বেশি রাজনৈতিক। আর বহুদিন ধরে এই শত্রুতা অব্যাহত থাকায় আমরা এটাকে ঐতিহাসিকও বলতে পারি। শত বছর আগের এক অসম চুক্তিই এই বিরোধের মূল কারণ; যেখানে একরকম হাতে-পায়ে বেধে ফেলা হয়েছিল তুরস্ককে। তুরস্ক এখন পরাশক্তি, ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত একমাত্র মুসলিম দেশ। ন্যাটোর ঘাঁটি ও অস্ত্রশস্ত্রও আছে তার ভূখণ্ডে। দেশটি নিজেই সামরিক ড্রোন নির্মাণ করছে, সেইসাথে বাইরে রফতানি করছে ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র। কাজেই অতীতের কোনো অন্যায় চুক্তি মেনে নেওয়ার মতো দুর্বলতা এখন আর তুরস্কের নেই। কিন্তু সেই বিতর্কিত চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলেও আছে সিরিজ নিষেধাজ্ঞা ও যুদ্ধের আশঙ্কা। কারণ, সেটা ছিল শান্তিচুক্তি। এ ধরনের চুক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না। যেকোনো সময় যেকোনো পক্ষ তা লঙ্ঘন করলেই একটা যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়। তবে উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করাও সম্ভব। অথবা একই ইস্যুতে নতুন কোনো চুক্তি সই হলে আগের চুক্তিটি এমনিতেই রদ হয়ে যায়।

‘মানলাম গ্রিসের সাথে তুরস্কের ঐতিহাসিক শত্রুতা আছে। কিন্তু মিশর, আমিরাত আর সৌদি আরবের মতো মুসলিম দেশ কেন গ্রিসের হয়ে কথাবার্তা বলছে? তাদের কী স্বার্থ এখানে?’

অমিতের এমন প্রশ্নে থামতে হলো আমাকে। তুরস্কের এরদোয়ান সরকারের সাথে উল্লিখিত দেশগুলোর বিরোধিতার মূল কারণ পলিটিক্যাল ইসলাম। আরব দেশ বিশেষত রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলো এই পলিটিক্যাল ইসলামকে এখন হুমকি মনে করে।

‘কিন্তু এরদোয়ান সরকার তো কোনো ইসলামি সরকার নয়।’

হ্যাঁ। এটা ঠিক যে সাংবিধানিকভাবে তুরস্ক একটি সেকুলার রাষ্ট্র; এরদোয়ান নিজেও তা-ই বলে থাকেন। কিন্তু এরদোয়ান ও তার দল একেপি আদর্শগতভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ—এটা বেশ পরিষ্কার। সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও মিশর ইস্যুতে তুরস্কের ভূমিকাই তার বড়ো প্রমাণ। এরদোয়ানের ব্রাদারহুড ঘনিষ্ঠতা নিয়েই সৌদি-আমিরাত আর মিশরের আপত্তি। কাতারের ওপর চার আরব দেশের সংঘবদ্ধ অবরোধের অন্যতম কারণও ছিল এই ব্রাদারহুড ইস্যু। আর কাতারের সেই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছিল তুরস্ক। কাজেই মিশর, আরব আমিরাত আর সৌদি আরবের মতো মুসলিম দেশগুলো তুর্কিদের মতো ঐতিহাসিক শত্রুর পালে বাতাস দেবে এমনটাই স্বাভাবিক। সেই দলে ভিড়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে তুরস্কের পটেনশিয়াল থ্রেট ফ্রান্সও।

## কী ছিল লুজান চুক্তিতে

অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে এই যে তুরস্ককে আমরা দেখছি, তার জন্ম হয়েছে লুজান চুক্তির মাধ্যমে। লুজানের মাধ্যমেই গ্রিস আর সিরিয়ার সাথে তুরস্কের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। অপরিবর্তিত থেকে গেছে ৪০০ বছর ধরে চলে আসা তুরস্ক-ইরান সীমান্ত। এই চুক্তিতে তুরস্কে থাকা গ্রিক নাগরিকদের স্বদেশে ফেরত দেওয়া এবং গ্রিসে বসবাসরত তুর্কি নাগরিকদের তুরস্কে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত হয়। দখলকৃত তুর্কি ভূখণ্ড ছেড়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীপক্ষ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি। তুর্কি ভূখণ্ড থেকে তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে যে দ্বীপগুলো আছে, সেগুলো তুরস্কের হাতেই থাকে। বাকি দ্বীপগুলো দিয়ে দেওয়া হয় গ্রিসকে। এর ফলে এজিয়ান সাগরে গ্রিসের মূল ভূখণ্ড থেকে শত শত মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও তুরস্কের অতি কাছের প্রায় সবগুলো দ্বীপ গ্রিসের হাতে চলে যায়। লুজান চুক্তির মাধ্যমে বসফরাস ও দারদেনালিস প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, দুই প্রণালির তীরবর্তী অঞ্চলকে অস্ত্রমুক্ত রাখতে হবে সব সময়। এমনকি এসবের আশপাশে কোনো অস্ত্রধারী বাহিনী রাখার এখতিয়ার হারায় তুরস্ক।

ফলে তুরস্ক এখানে সামরিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বসফরাস দিয়ে অতিবাহিত জাহাজ থেকে টোল আদায়ের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। অবশ্য ১৯৩৬ সালে অপর এক চুক্তির (মন্ট্রেক্স চুক্তি) মাধ্যমে সাক্ষ্যনা দেওয়া হয় তুর্কিদের। বসফরাস ও দারদেনালিস প্রণালির পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পায় দেশটি। তবে এই চুক্তিতেও বলা হয়, প্রণালি দুটি দিয়ে অতিক্রম করা বিদেশি জাহাজ থেকে টোল আদায় করা চলবে না। এখন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ আর সার্ভিস চার্জ বাবদ নামমাত্র অর্থ আদায় করে থাকে তুর্কি কর্তৃপক্ষ। তুরস্ক এখন তাই বিকল্প একটি নৌরুট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রয়োজনমতো টোল আদায় করা যাবে সেখান থেকে। এই প্রকল্পের ন্যাম দেওয়া হয়েছে ‘ক্যানাল ইস্তাম্বুল’।

## সাইপ্রাস নিয়ে দ্বন্দ্ব

ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। সংখ্যাগুরু গ্রিকদেরই আধিপত্য এখানে। তুর্কিদের একটি অংশও অবশ্য এখানে বসবাস করে, কিন্তু সংখ্যায় তারা গ্রিকদের সমতুল্য নয়। ১৫৭১ সালে অটোমানরা দ্বীপটির দখল নেয়। কিন্তু তুর্কি আধিপত্যকে দুর্ভাগ্যের চাদরে ঢেকে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অটোমানদের পতনের পর দ্বীপটি চলে যায় ইংরেজদের হাতে। সাইপ্রাসে বসবাস করা গ্রিক ও তুর্কিদের মধ্যে আজও যে বিভাজন ও বৈরিতা আমরা দেখছি, তার শুরু তখন থেকেই। এজন্যই বলছি, এই শত্রুতা ঐতিহাসিক। গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ সাইপ্রাসকে খ্রিসের মূল ভূখণ্ডের সাথে জুড়ে দিতে চেয়েছিল। এমনকি তুর্কিদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থি গ্রিকদের উসকে দিয়েছিল তারা।

ইংরেজমুক্ত হয়ে স্বাধীন ‘রিপাবলিক অব সাইপ্রাস’ গঠিত হয় ১৯৬০ সালে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানে অবশ্য সংখ্যালঘু তুর্কি সাইপ্রিয়টদের অধিকার অস্বীকার করা হয়নি। তুরস্ক ও গ্রিস উভয়কেই বলা হয়েছিল—‘দ্বীপরাষ্ট্রটি তোমরা দেখভাল করো।’ কিন্তু তাতেও গ্রিক-তুর্কি বিরোধ মেটেনি। তুর্কি সাইপ্রিয়টদের বাড়ি-ঘর হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়, অনেকেই উচ্ছেদ করা হয় বসতভিটা থেকে। এ সবকিছুই করে গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা। কয়েক দফায় এখানে সেনা পাঠিয়েছে গ্রিক সরকার। জাতিসংঘও হস্তক্ষেপ করেছে পরবর্তী সময়ে; কিন্তু সংকট চলমান। এর মধ্যেই পরিস্থিতি একদম গড়বড় করে দেয় একটি সামরিক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেয় গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা। ফলে সাইপ্রাসের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে তুর্কি সাইপ্রিয়টদের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবেই হস্তক্ষেপ করে অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি তুরস্ক। দ্বীপটির উত্তর অংশ দখলে নেয় তুর্কি বাহিনী। এই অংশ এখন তুর্কি সাইপ্রাস বা নর্দান সাইপ্রাস নামে পরিচিত। তুরস্ক ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো রাষ্ট্র সাইপ্রাসের এই অংশকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।



ছবি : ইকোনোমিস্ট

‘রিপাবলিক অব সাইপ্রাস’ নামে পরিচিত দ্বীপের দক্ষিণ অংশ জাতিসংঘের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ২০০৪ সালে উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়। উত্তর সাইপ্রাসের ৬৫% জনগণ সম্মতি দিলেও দক্ষিণের ৭৬% জনগণ ‘না’ ভোট দেয়। ফলে একত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। তুরস্ক আর উত্তর সাইপ্রাসের সাথে মূল সাইপ্রাসের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সাইপ্রাসের সমুদ্রসীমার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তুরস্ক ও উত্তর সাইপ্রাস নিজেদের অংশ বলে দাবি করে থাকে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইন অনুযায়ী তুরস্কের দাবিকে একেবারে অন্যায়্য বলা যাবে না; কিন্তু তার পথের কাঁটা সেই লুজান চুক্তি। শত বছর আগের এই বিতর্কিত চুক্তির মাধ্যমেই তুরস্ককে ঠকিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ। তুরস্ক অবশ্য এখন আর এই চুক্তিকে প্রাসঙ্গিক মনে করে না।

বিরোধ নতুন করে ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হলো—সমুদ্রে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান। মূল সাইপ্রাস তার দাবিকৃত এলাকায় আমেরিকান এক্সন মবিল, ফরাসি টোটাল এবং ইতালিয়ান অ্যানি কোম্পানিকে গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুসন্ধানী কাজের জাহাজ পাঠিয়েছে তুরস্ক। গ্রিস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্বভাবতই সাইপ্রাসকে সমর্থন দিচ্ছে কারণ দেশটি ইইউ-এর সদস্য। অন্যদিকে উত্তর সাইপ্রাসে এখনও তুরস্কের ৪০,০০০ সেনা মোতায়েন রয়েছে। মূলত পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যথাক্রমে নর্দার্ন সাইপ্রাস এবং মূল সাইপ্রাসকে প্রক্সি হিসেবে ব্যবহার করছে তুরস্ক ও গ্রিস।